খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ হয়নি। বিভিন্ন অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটি বড়ো গণঅভ্যুত্থানের চেহারা পেয়েছিল।

টুকরো কথা

সিপাহি বিদ্রোহ না জাতীয় বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে বিদ্রোহের শুরু থেকে বিতর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ ব্রিটিশ ভাষ্যকারের মতে ঐ বিদ্রোহ কেবল সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ জনগণ নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশের জন্য ঐ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়েছিল মাত্র। কিন্তু বিদ্রোহের সময়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছিল যে ১৮৫৭-র

বিদ্রোহ কি নিছক সেনা বিদ্রোহ? না কি তা ক্রমেই ‘জাতীয় বিদ্রোহ’-এর রূপ নিচ্ছে? বিদ্রোহের সময়ই একটি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, যাকে সেনাবিদ্রোহ মনে করা হচ্ছে, তা আদতে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’। ধীরে ধীরে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা ‘ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে খানিক বাড়তি আবেগ ছিল। কারণ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের কোনো ধারণা ছিল না। বরং বিদ্রোহী নেতৃত্বের অনেকেই একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্রোহীরা

পুরোনো মুঘল শাসন ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আবার কেবল সিপাহি বিদ্রোহ বললেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না।

ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনীর লখনৌ পুনর্দখল। মূল ছবিটি থমাস জোনস বার্কার-এর আঁকা।

একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছিল যে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ-শাসনে তাদের 'দীন' (বিশ্বাস) ও 'ধরম' (ধর্ম) নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সব বিদ্রোহীরা একে অন্যকে মুখোমুখিভাবে না চিনলেও, বিদেশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। পাশাপাশি পুরোনো মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যও বিদ্রোহীদের ছিল না। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্রোহীরা মুঘল কর্তৃত্বকে স্বীকার করতেন।

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। মূল ছবিটি অগস্ত সোয়েফ্ট-এর আঁকা।

অনেক জায়গাতেই সামন্তপ্রভু ও জমিদাররা বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে পড়লেও, সমস্ত ক্ষেত্রে তারাই শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং অনেক সামন্তপ্রভু ও জমিদারই খানিক পরিস্থিতির চাপে জনগণের বিদ্রোহে যোগ দেন। এমনকি বাহাদুর শাহ জাফর নিজেও বিদ্রোহীদের তরফে নেতৃত্বের প্রস্তাব পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ও নানা সাহেবকেও খানিক জোর করেই সিপাহিরা বিদ্রোহে টেনে এনেছিল। ফলে সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের অংশগ্রহণের উপর ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নির্ভরশীল ছিল না। প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সভা করে কর্তব্য ঠিক করতো। তারপর একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চাপাটি (রুটি) পাঠানোর মধ্যে

দিয়ে খবরাখবর আদানপ্রদান করা হতো।

ব্রিটিশ কোম্পানি অবশ্য চূড়ান্ত দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে দিল্লি পুনরায় অধিকার করে নেয় কোম্পানির সেনাবাহিনী। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়।

বিদ্রোহী সিপাহিদের শাস্তি দেওয়ার একটি দৃশ্য।

টুকরো কথা

বাহাদুর শাহ জাফর-এর বিচার

মুঘল বাদশাহর লালকেল্লার দেওয়ান-ই খাসে বসে শাসন চালাতেন। সেখানেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর-এর বিচারের জন্য আদালত বসে। বিচারের আগে দেওয়ান-ই খাসের বাইরে ৮২ বছরের বৃদ্ধ সম্রাটকে প্রায় দেড়ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তারপর তাঁকে ভেতরে ডেকে একটি সাধারণ আসনে বসতে দিয়ে শুরু হয় বিচার। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিচার চলার মধ্যে সাক্ষিদের জেরা করার সুযোগও মুঘল সম্রাটকে দেওয়া হয়নি। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বৃদ্ধ সম্রাটকে দোষী ঘোষণা করে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়।

কিন্তু সমস্ত দমন-পীড়ন সত্ত্বেও বিদ্রোহ থেমে যায়নি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সেনারা উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহীদের হারিয়ে দেয়। বস্তুত, ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা অসম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের না ছিল যথেষ্ট সম্পদ, না ছিল যথেষ্ট লোকবল। তাছাড়া তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ছিল না। তার উপরে বিদ্রোহীরা প্রায় সকলে দিল্লিতে জড়ো হওয়ার ফলে বেশি দূর বিদ্রোহ ছড়াতে পারেনি। কার্যত দিল্লি পুনর্দখল করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি বিদ্রোহের অনেকটাই দমন করে ফেলেছিল।

নিজে করো

"তিনি পুরুষের মতো পোশাক পরতেন। মাথায় পাগড়ি। তিনি পুরুষের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়তেন। মুখশ্রী সাধারণ –গুটিবসন্তের দাগ, কিন্তু সুন্দর চেহারা এবং টিকালো নাক। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল বুদ্ধির ছাপ। তিনি খুব একটা ফর্সা ছিলেন চড়তেন। মুখশ্রী সাধারণ – গুটিবসন্তের দাগ, কিন্তু সুন্দর চেহারা এবং টিকালো নাক। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল বুদ্ধির ছাপ। তিনি খুব একটা ফর্সা ছিলেন না। তিনি সোনার নূপুর ও ... নেকলেস পরতেন। তিনি মসলিন পরতেন।"

উপরের বর্ণনাটি রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের। লর্ড

ক্যানিং, যিনি মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, রানির এই বর্ণনা লিখে রেখেছিলেন। বর্ণনাটি থেকে ঝাঁসির রানির বিষয়ে তুমি কী জানতে পারো?

বাহাদুর শাহ জাফর ও তাঁর পুত্রদের বন্দি করার দৃশ্য। মূল ছবিটি উইলিয়ম হজসন-এর আঁকা।

টুকরো কথা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ : কলকাতার অভিজ্ঞতা

"১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খৃষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর -জেনেরাল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন — কালাদের অস্ত্র শস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ... আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র-সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটী জিনিষের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুইচারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ

মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes there?)। তাহা হইলেই বলিতে হইত, "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।"

[উদ্ধৃত অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রী-র রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অভিঘাতে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন লোপ পেয়েছিল। তার বদলে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সরাসরি ভারতের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। আইন জারি করে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি রানির মন্ত্রীসভার একজন সদস্যকে ভারত -শাসন বিষয়ে দেখভালের জন্য সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল পদটি তুলে দেওয়া হয়। তার জায়গায় রাজপ্রতিনিধি

বা ভাইসরয় পদ তৈরি করা হয়। লর্ড ক্যানিং যিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, তিনি প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর থেকে ভারত শাসন সংক্রান্ত ঐ আইনটি বলবৎ হয়। ভারতে শুরু হয় রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন।

রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ভারতে জারি করা একটি মোহর।

ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী গণআন্দোলন
(উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ)
উত্তর
মিরাট
দিল্লি
বেরেলি
লখনৌ
কানপুর
ফৈজাবাদ
গোয়ালিয়র
কোল
ঝাঁসি
আরা
সন্ন্যাসী-ফকির
ব্যারাকপুর
ওয়াহাবি
ফরাজি
জবলপুর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
পলিগার
১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র
১৮৫৭-র পূর্বে সিপাহি অভ্যুত্থান
ভেলোর
কিত্তুর
১৮৫৭-র পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ
১৮৫৭-র পূর্বে ধর্ম-কেন্দ্রিক কৃষক বিদ্রোহ
মাপিলা
১৮৫৭-র পূর্বে অন্যান্য বিদ্রোহ
ত্রিবাঙ্কুর
তিন্নেভেলি
শ্রীলঙ্কা
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়
ভারত মহাসাগর

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক -স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
হিন্দু প্যাট্রিয়ট	শেষ মুঘল সম্রাট
বাহাদুর শাহ জাফর	সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন
রাজা রামমোহন রায়	ব্রাহ্ম সমাজ
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	সিধু ও কানহু
সাঁওতাল বিদ্রোহ	নীল বিদ্রোহ

২। বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :

ক) পণ্ডিতা রমাবাঈ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ভগিনী শুভলক্ষ্মী, রানি লক্ষ্মীবাঈ।

খ) আত্মারাম পাণ্ডুরং, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, জ্যোতিরাও ফুলে, বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু।

গ) রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী।

ঘ) বাহাদুর শাহ জাফর, নানা সাহেব, তিতুমির, মঙ্গল পাণ্ডে।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) ঔপনিবেশিক সমাজে কাদের 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' বলা হতো?

খ) নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কোন কোন প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন?

গ) স্যর সৈয়দ আহমদের সংস্কারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

ঘ) তিতুমির কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :

ক) সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলনের মধ্যে মূল মিলগুলি বিশ্লেষণ করো। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য কীভাবে চেষ্টা করেছিলেন?

খ) ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল বক্তব্য কী ছিল? ব্রাহ্ম আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাগুলি বিশ্লেষণ করো।

গ) সাঁওতাল হুল ও নীল বিদ্রোহের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো। উভয় বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই হিন্দু প্যাট্রিয়টের কী ভূমিকা ছিল?

ঘ) তুমি কী মনে করো ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ কেবল 'সিপাহি বিদ্রোহ' ছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে) :

ক) মনে করো তোমার সঙ্গে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে যথাক্রমে সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।

খ) মনে করো তুমি একজন সাংবাদিক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঐ বিদ্রোহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখো।

৩ জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা বসেছিল। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেই সভায় সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সভা থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু হয়েছিল। তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম-এরও উদ্যোগ ছিল। হিউম তাঁর কাজের সূত্রে গোটা উপমহাদেশ ঘুরেছিলেন। সেই সুবাদে বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। হিউম সেই নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে

আলোচনায় বসার জন্য বলতে থাকেন। পুনায় একটি বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও পুনায় কলেরার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় ঐ অধিবেশন সেখানে করা সম্ভব হয়নি। তার বদলে বোম্বাই শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে অধিবেশনটি বসে। সেই অধিবেশনই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।

জাতীয় কংগ্রেসের আগে জাতীয়তাবাদী সভাসমিতি

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বেশ কিছু সভাসমিতি। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন রূপে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দাবিদাওয়া তুলে ধরার প্রশ্নে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন

হিসেবে গড়ে ওঠে জমিদার সভা (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। মূলত কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি তিনটিতে আঞ্চলিক গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আরও অনেক সভাসমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত সময়কালকে তাই অনেকেই সভাসমিতির যুগ বলেছেন। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকলেও ধীরে ধীরে এই সংগঠনগুলি আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদের প্রসারে ভূমিকা নিয়েছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলা, শিশির কুমার ঘোষের ইন্ডিয়ান লিগ (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ), কর্নেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কির থিওস্যফিক্যাল সোসাইটি এবং সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ। মূল ফটোগ্রাফটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তোলা।

টুকরো কথা

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় সম্মেলন (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের মধ্যে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পদক্ষেপগুলি বড়ো বেশিরকম জমিদার ঘেঁষা ছিল। অন্যদিকে কম বয়সি সদস্য অনেকেই কেবল জমিদারদের পক্ষ ছেড়ে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করতে উৎসাহী ছিলেন। তার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তরুণেরা সংগঠিত হন। সুরেন্দ্রনাথের সঙেগ ব্রিটিশ সরকারের নানা বিষয়ে সংঘাত তৈরি হয়েছিল।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা তৈরি হয়। দেশের জনগণকে বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একজোট করাই ঐ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন বা জাতীয় সম্মেলন কলকাতায় আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন রামতনু লাহিড়ি।

টুকরো কথা

ইলবার্ট বিল বিতর্ক

কোনও ভারতীয় বিচারকের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার ছিল না। গভর্নর জেনারেল

লর্ড রিপনের আইনসভার সদস্য সি.পি. ইলবার্ট বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে এই অসাম্য দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্তাবিত একটি বিলে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার দেওয়া হয়। এই বিলের প্রতিবাদে ইউরোপীয়রা সংগঠিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্বেতাঙ্গদের এই আন্দোলনের ফলে ঐ বিল প্রত্যাহার করা হয়। বিল প্রত্যাহার হলে ভারত সভার উদ্যোগে ভারতীয়রা আন্দোলন শুরু করেন। উভয়- পক্ষের আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন ইলবার্ট বিল বিতর্ক নামে পরিচিত। ভারত সভার আন্দোলনের জেরে ভারতীয় বিচারকরা শর্ত সাপেক্ষে ইউরোপীয় বিচারকদের বিচার করার অধিকার পায়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পিছনে হিউমের ভূমিকাকে ঘিরে একধরনের অতিকথন তৈরি হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট উইলিয়ম ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের একটি জীবনী সেই জন্য দায়ী। ওয়েডারবার্ন জানান যে, হিউম ও বড়োলাট লর্ড ডাফরিনের যৌথ উদ্যোগেই নাকি জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল। এই তত্ত্বটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 'হিউম-ডাফরিন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' বলে পরিচিত।

ইলবার্ট বিলের পক্ষে ভারতীয়দের আন্দোলন। মূল ছবিটি দ্য গ্রাফিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

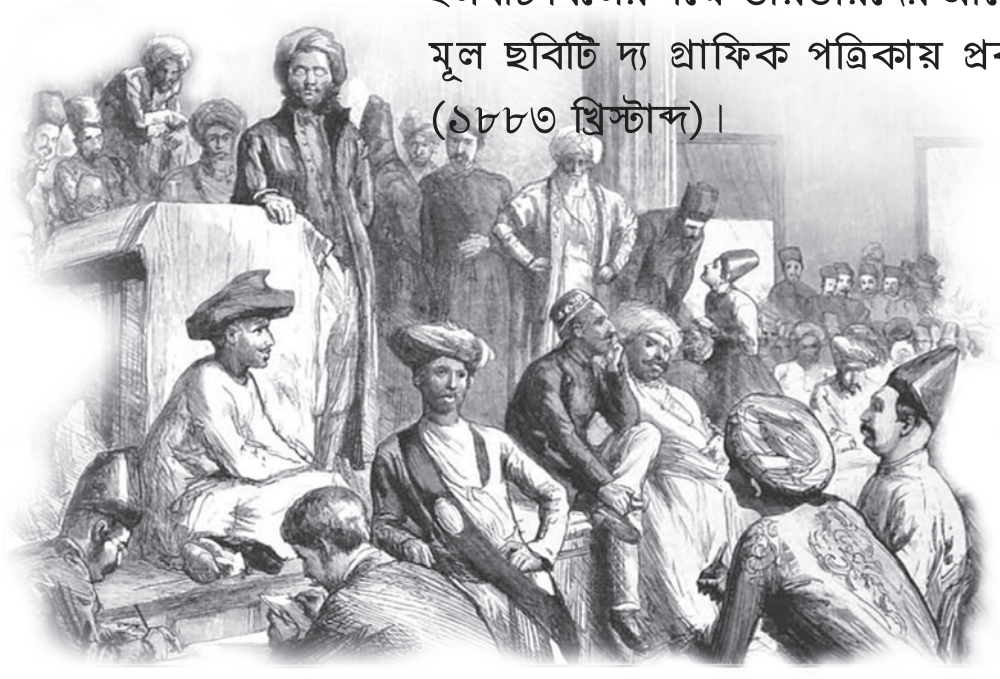

দীর্ঘদিন 'হিউম-ডাফরিন-ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' দিয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ব্যাখ্যা করা হতো। কিন্তু ঐ তত্ত্বে বেশ কিছু ফাঁক দেখা যায়। তাছাড়া কংগ্রেসের উদ্যোগ নিয়ে ডাফরিন সন্দিহান ছিলেন। 'সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি' হিসাবে তিনি কংগ্রেসকে বিদ্রুপও করেন। ফলে ডাফরিনের নানা বক্তব্য থেকেই কংগ্রেস বিষয়ে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব ফুটে ওঠে।

তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের কোনো ভূমিকাই ছিল না— তা নয়। কিন্তু তাকে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বের' ধাঁচে ফেললে অনৈতিহাসিক দোষ ঘটবে। নানা ঘটনায় ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবে উদারমনা হিউম চেয়েছিলেন এমন একটি সংগঠন তৈরি হোক, যা ভারতীয়দের

স্বার্থ রক্ষা করবে। তবে হিউম যদি উদ্যোগ নাও নিতেন তবু ঐ সময় নাগাদ জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতো। কারণ তার সমস্ত পটভূমি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত ভারতীয়রা নানা রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেইসব উদ্যোগগুলিকে একজোট করার জন্য দেশজুড়ে নানা চেষ্টা করা হয়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নানা প্রকার প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেইসব প্রতিবাদের লক্ষ্য কখনও ছিল ব্রিটিশ-সরকারের আয়করনীতি, কখনও বৈষম্যমূলক আয়-ব্যয়। পাশাপাশি দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাগিচা শ্রমিকদের অবস্থা, আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে

ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়েও আন্দোলন করা হয়েছিল।

এইসমস্ত প্রতিবাদ আন্দোলনের চৌহদ্দি কেবল তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই আটকে ছিল না। লাহোর, অমৃতসর, আলিগড়, কানপুর, পাটনার মতো প্রাদেশিক শহরগুলির ইংরেজি শিক্ষিত মানুষেরা ঐসব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বোধের বাইরে একটা নতুন রাজনৈতিক বোধ তৈরি হয়েছিল। সেই বোধ অনেক বেশি জাতীয়। কংগ্রেস সেই জাতীয়-বোধেরই একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ ছিল।

একেবারে গোড়া থেকেই দেশের ভিতরের আঞ্চলিক পার্থক্য ও স্বার্থগুলোর বাইরে বৃহত্তর চিন্তা ও আদর্শের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস।

ফি বছরে দেশের এক একটি জায়গায় কংগ্রেসের অধিবেশন করা হবে— এই ছিল নীতি। বলা হয়, যে অঞ্চলে অধিবেশন বসবে সেখানের কেউ সভাপতি হতে পারবেন না। আঞ্চলিক স্বার্থ, মানসিক দূরত্ব সবকিছু দূর করে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যই এইসব নীতি নিয়েছিল কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঠিক করা হয় যদি কোনো প্রস্তাবে বেশিরভাগ হিন্দু কিংবা মুসলমানদের সমর্থন না থাকে, তবে সেই প্রস্তাব স্থগিত থাকবে। বস্তুত, গণতান্ত্রিক ও সার্বিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কংগ্রেস পরিচালনার লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস-নেতৃত্বের।

অবশ্য মনে রাখা দরকার গোড়া থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সাংগঠনিক নানা দুর্বলতা ছিল। ভারতীয় সমাজের সমস্ত ধরনের লোকেরা কংগ্রেসের

আওতায় ছিল না। তাছাড়া আঞ্চলিক, লিঙ্গগত ও শ্রেণিগত প্রতিনিধিত্ব সমান ছিল না। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজন ও তাদের অভাব -অভিযোগকে সরাসরি সংগঠনের বৃত্তে আনতে চায়নি কংগ্রেসের আদি নেতৃত্ব। বস্তুত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'সম্মাননীয়' পেশার (যেমন- আইনজীবী) মানুষজনেরাই কংগ্রেসের নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন। পাশাপাশি, ভৌগোলিকভাবে বিচার করলে, কংগ্রেসের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী ৭২জন ভারতীয় বেসরকারি প্রতিনিধির মধ্যে ৩৮জনই ছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির। ফলে, মুখে 'সর্বভারতীয়ত্বের' দাবি করা হলেও, বাস্তবে

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রেসিডেন্সির কিছু শিক্ষিত পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও জমিদারই ছিল কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ। সম্প্রদায়গতভাবেও প্রথম দিকের কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে উচ্চবর্গীয় হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এইসব সমালোচনার বিষয়ে কংগ্রেস -নেতৃত্ব বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের 'জাতির প্রতিনিধি' হিসেবে প্রচার করে গৌরব বোধ করতেন। তবে এর ফলে সামাজিক ও সম্প্রদায়গতভাবে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচিগুলি প্রকৃত 'জাতীয়' চরিত্র হারিয়েছিল।

আদিপর্বে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক পন্থা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার লক্ষ্যে

চলেনি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের আমূল বদলের কর্মসূচি কংগ্রেসের ছিল না। বরং ভারতে ‘অ-ব্রিটিশ’ সুলভ কিছু শাসনপদ্ধতি সংশোধনের জন্য কংগ্রেস-নেতৃত্ব আবেদন-নিবেদন করতেন সরকারের কাছে। প্রথম অধিবেশনেই (১৮৮৫ খ্রি:) সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলেন যে, কংগ্রেস কোনো ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের মঞ্চ নয়। বস্তুত, আদি পর্যায়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি নিজেদের আনুগত্য ও

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

লর্ড ডাফরিন

সমর্থন জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর ঠিক সেই কারণেই হিউমকে মধ্যস্থ হিসাবে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের কাজকর্মের সঙ্গে। তার ফলে আশা করা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে সন্দেহের নজরে দেখবে না।

এইভাবে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫-'০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ২০-২২ বছর জাতীয় কংগ্রেস ভারতের উচ্চবর্গের মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। তবে সরকারের কাজে ভারতীয় জনগণের সম্যক অংশগ্রহণ থাকা উচিত --- কংগ্রেসের এই দাবিটির গুরুত্ব ছিল।

টুকরো কথা

ব্রিটিশ শাসনে দমনমূলক কয়েকটি আইন

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক জারি করেন নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার নাটকগুলির প্রচার বন্ধ করা। তারপরে লর্ড লিটনের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বেজায় সমালোচনা করে। তার পাল্টা লর্ড লিটন দেশীয় মুদ্রণ আইন জারি করেন (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ আইনে বলা হয় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি কোনো সরকার-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করতে পারবেনা। যদি এর অন্যথা হয় তবে সরকার ঐ সংবাদপত্রের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করবে।

লর্ড লিটন

ঐ আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড রিপন ঐ আইনটি বাতিল করেন। লর্ড লিটন ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য অস্ত্র আইন জারি করেছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দু-দশক: অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

প্রথম দু-দশকের কার্যকলাপের নিরিখে বিচার করলে কংগ্রেসের আদিপর্বের নেতৃত্বকে ‘নরমপন্থী’ বলে চিহ্নিত করা যায়। সেই সময়ে

কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল বার্ষিক অধিবেশন-কেন্দ্রিক। তাকে ব্যঙ্গ করে ‘তিন-দিনের তামাশা’-ও বলা হতো। বিভিন্ন প্রতিনিধি ঐসব অধিবেশনে নানারকম বক্তব্য ও প্রস্তাব পেশ করতেন। সবশেষে তার মধ্যে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে অধিবেশন শেষ হতো। তবে বছরভর ঐসব গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে জাতীয় স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করার মতো উদ্যোগ দেখা যেত না। তাছাড়া বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিগত পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সারা বছর সংগঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়ার সময় ও মানসিকতা— কোনোটাই তাঁদের ছিল না। যদিও মনে রাখা দরকার ‘নরমপন্থা’র মধ্যেও নানা পার্থক্য ছিল। তবে মোটের উপর

প্রতিবাদ-আন্দোলনের পদ্ধতি ও লক্ষ্যগুলি ছিল একইরকম।

অধিকাংশ নরমপন্থীর কাছে ব্রিটিশ শাসক ছিল ‘বিধির বিধান’। তাই নরমপন্থীরা অভিযোগ করতেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সর্বদা আইনের শাসন মোতাবেক চলছে না। তবে একথা বলা উচিত যে, শ্রেণিগত স্বার্থের থেকে সবসময় বেরোতে না পারলেও সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়কে নরমপন্থীরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। সেদিক থেকে তাঁদের কাজকর্মে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ লক্ষ করা যায়।

নরমপন্থীরা চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শাসনের আওতায় থেকেই ভারত আংশিক স্বশাসন ভোগ করবে। আইনসভাগুলিতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দাবি জানাতেন নরমপন্থীরা। অর্থাৎ,

পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন আদি কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রধান কর্মসূচি ছিল না। কিছু কিছু সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যেই তাঁদের প্রতিবাদ-আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছিল। নরমপন্থীরা অবশ্য আশা করতেন একসময় ভারতবাসীরা স্বশাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সেই স্বশাসনের অধিকার স্বীকার করে নেবে।

টুকরো কথা

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিশ্লেষণ

"…. আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং সভ্য জগতে আমাদের মর্যাদার স্থান করে নেওয়ার জন্য

প্রয়োজন হলে আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়মতন্ত্র ও সীমাবদ্ধতার গণ্ডী ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাবনা সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে এই যে সে রকম প্রয়োজন এখনও দেখা দেয়নি।.... আমরা যদি ঘোষণা করি যে আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হতে চাই, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের সদস্য হিসাবে কোন দায়-দায়িত্বের বাধার মধ্যে না থেকে খাঁটি স্বায়ত্তশাসন চাই, কেউই আমাদের সে আশা আকাঙ্ক্ষায় আপত্তি করতে পারে না। .... কিন্তু আমাদের পরিবেশের কথা ঘটনা পরম্পরার কথা ভাবতে হবে।.... তাহলে এখন যদি আমরা এই ভাবাদর্শকে আংকড়ে ধরে থাকি এবং আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে তাকে জোরদার করার চেষ্টা করি তা হলে কি

ঘটবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি আমাদের সে আশা পূরণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হবে কিন্তু আমরা যদি আমাদের দাবি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির সমস্ত প্রভাব আমাদের পক্ষেই থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা যে কেবলমাত্র কোন বাধাই পাব না, তা নয়, আমরা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সহানুভূতি হয়ত সাহায্যও পাব;...।...

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের পরে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে হলে আরো উন্নতি সাধনের জন্য কি করা না করা, তা আমাদের উত্তরাধিকারীদের ভাবনার জন্য রেখে যেতে পারি। .... ইতিমধ্যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করার জন্য কাজ করে যাব।"

[উদ্ধৃত অংশটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আত্মজীবনী A Nation in Making-এর বাংলা তরজমা থেকে নেওয়া। বাংলা তরজমাটি নলিনীমোহন দাশগুপ্ত-র করা। (বাংলা তরজমার মূল বানান অপরিবর্তিত)]

যদিও ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে নরমপন্থীদের এইসব ভাবনাচিন্তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তাই নরমপন্থীদের প্রায় কোনো দাবিই সরকারের তরফে মানা হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটানো হয়নি। সেখানে সদস্য নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন বা বেছে নেওয়ার উপরেই জোর পড়েছিল। তাছাড়া আইনসভাতে আয়-ব্যয়ের হিসেব নিয়ে ভোটাভুটি করা যেত না । এমনকি আইনসভাকে না জানিয়ে আইন চালু করার ক্ষমতাও ব্রিটিশ সরকারের ছিল।

নরমপন্থীদের আর একটি দাবি ছিল সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের নিয়োগ বাড়ানো হোক। তাঁরা বলতেন, প্রশাসনের ভারতীয়করণ হলে, সেই প্রশাসন দেশীয় মানুষের অভাব -অভিযোগগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। তাছাড়া, অবসরপ্রাপ্ত ইউরোপীয় চাকুরেদের প্রদেয় যাবতীয় অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। ঐ পদগুলিতে ভারতীয়রা বহাল হলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে। নরমপন্থীদের দাবি ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার বয়স ১৯-এর বদলে ২৩ বছর করতে হবে। পাশাপাশি, ভারতে ও লন্ডনে একইসঙ্গে পরীক্ষাটি নিতে হবে। কিন্তু এই দাবিগুলির প্রতি ব্রিটিশ-শাসকেরা মোটেই নজর

দিতে চায়নি। কারণ, প্রশাসনের ভারতীয়করণ তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। ক্রমে পুরো বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীকে বিদেশের নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যবহার করা ও যুদ্ধখাতে খরচ বাড়ানো নিয়েও নরমপন্থীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। তবে ব্রিটিশ সরকার এই প্রসঙ্গেও বিশেষ মনোযোগ দেয়নি।

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে নরমপন্থীদের প্রায় কোনো দাবিতেই ঔপনিবেশিক শাসক গুরুত্ব দিতে নারাজ। বস্তুত, নরমপন্থীদের আন্দোলনের নীতি ও সংকুচিত সামাজিক ভিত্তি এর জন্য দায়ী ছিল। ফলে, এইদিক থেকে দেখলে কংগ্রেসের

নরমপন্থীরা বাস্তবে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার কোনো জরুরি সংস্কার ঘটাতে পারেননি।

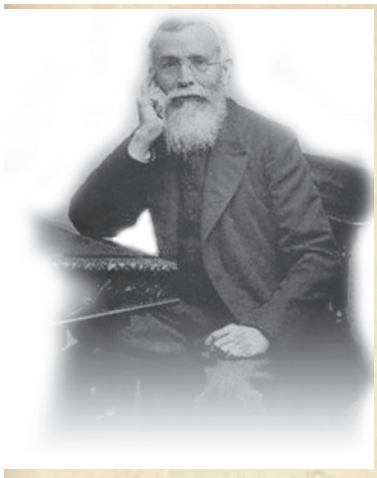

দাদাভাই নৌরজি

টুকরো কথা

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

একটি বিষয়কে ঘিরে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তা হলো, ভারতের আর্থিক দুরবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা নিয়ে নরমপন্থী নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism) বলা হয়। এই কাজে বিশেষ করে দাদাভাই নৌরজি (পেশায় ব্যবসায়ী), মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (পেশায় বিচারক) ও

রমেশচন্দ্র দত্ত (পেশায় সিভিল সার্ভেন্ট) — এই তিনজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের দারিদ্র্য ও ব্রিটিশ- শাসনের সম্পর্ক নির্ণয় করা। নরমপন্থীদের যুক্তি ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র ক্রমে বদলে গিয়েছে। ভারত ধীরে ধীরে ব্রিটেনের কৃষিজ কাঁচামাল আহরণের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যগুলির বৃহৎ বাজার হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করতে থাকে ঔপনিবেশিক সরকার। এসবের ফলে ভারতের কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিকে কেবল ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে ভারত। আর সেই উদ্যোগের যাবতীয় লাভ চলে যায় ব্রিটেনে। ফলে

রমেশচন্দ্র দত্ত

ভারতীয় কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হয়, দেশের যাবতীয় সম্পদ চলে যায় বিদেশে। নরমপন্থীদের এই যুক্তিকে 'সম্পদ নির্গমন' বলা হয়। তাঁরা বলতেন এইভাবে সম্পদ নির্গমনের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি উঁচু হারে ভূমি-রাজস্ব দিতে বাধ্য হয় কৃষকরা। ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য মার খায়। কারণ, ব্রিটিশ পণ্য আমদানিতে শুল্ক বা মাশুল বসানো হতো না। তার ফলে ভারতের শিল্পায়ন ব্যাহত হতে থাকে। শিল্পের বদলে কৃষির উপর চাপ বাড়ে। অধিকাংশ লোক

কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ার ফলে ও কৃষির উপযুক্ত কাঠামো না থাকায় দেশের দারিদ্র্য আরও বেড়েছিল। এই নেতিবাচক বিষয়গুলির প্রতিকার করে একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার ভাবনাই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণেও নরমপন্থী রাজনীতি ভারতের বৃহত্তর জনগণের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ফলে নরমপন্থীরা ক্রমে সমালোচিত হয়েছিলেন তাঁদের আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে। আদি পর্যায়ের অনেক কংগ্রেসি কার্যকলাপের পিছনে জমিদারদের আর্থিক সহায়তা ছিল। ফলে জমিদারদের স্বার্থ বাদ দিয়ে চলার কথা কংগ্রেস ভাবতে পারেনি। তার জন্যই

কৃষকদের স্বার্থে প্রকৃত কোনো কর্মসূচি ছিল না নরমপন্থীদের কাছে। এমনকি রমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে কংগ্রেসেরই একটি অংশ ছোটো কৃষকদের স্বার্থের কথা তুলে ধরত, তারা ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একইভাবে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সমর্থন-পুষ্ট কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তাছাড়া নরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে দুই-একটি ব্যতিক্রম (যেমন-- বদরুদ্দিন তৈয়াবজি) বাদ দিলে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসে প্রায় ছিলই না। ফলে, প্রথম কুড়ি বছরের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ প্রায় আলোচনাই করা হতো না।

অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে নরমপন্থী রাজনীতি লক্ষ্য ও কর্মসূচির দিক থেকে ছিল সীমিত চরিত্রের। তাতে জনগণের অংশগ্রহণ প্রায় ছিল না। সেই কারণেই ব্রিটিশ-প্রশাসন জাতীয় কংগ্রেসকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। বরং, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েই বেশি মশগুল বলে কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করা হতো।

এভাবে বিচার করলে অবশ্য কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতির পর্যায়টিকে পুরো ব্যর্থ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন নরমপন্থীরা। উচ্চশিক্ষিত হওয়ার ফলেই যুক্তিনির্ভর

সাংবিধানিক রাজনীতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র তাঁরা তৈরি করেছিলেন। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলন গণআন্দোলন ছিল না। সেইসব আন্দোলনের থেকে বিশেষ কোনো সুবিধাও ভারতীয়রা পায়নি। তবুও, ঐ যুক্তিনির্ভর রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক আধুনিকতা ভারতীয় সমাজে দেখা গিয়েছিল। সেইখানেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের সঙ্গে ১৮৮৫-র জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের তফাত।

নিজে করো

তোমার ক্লাসে বন্ধুরা দুটি দলে ভাগ হয়ে নরমপন্থা ও চরমপন্থার যুক্তি ও বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে বিতর্কসভা আয়োজন করো।

চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব

বাস্তবগ্রাহ্য রাজনৈতিক সাফল্য লাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে কংগ্রেসের ভিতরেই নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন পদ্ধতিকে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বলে ব্যঙ্গ করা হতে থাকে। বিংশ শতকের শুরুতেই নরমপন্থার নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। নরমপন্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটে। চরমপন্থার সমর্থকরা কংগ্রেসের 'চরমপন্থী' গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হন। প্রধানত বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে চরমপন্থার বিকাশ হয়। ঐ তিনটি অঞ্চলের প্রধান তিন নেতা ছিলেন যথাক্রমে বিপিনচন্দ্র

পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রাই। এঁদের তিনজনকে একসঙ্গে 'লাল-বাল-পাল' বলে অভিহিত করা হতো। তবে অন্যান্য অঞ্চলেও কম-বেশি চরমপন্থী মতামতের প্রসার ঘটেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো চরমপন্থা কী কেবল নরমপন্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছিল? একদিক থেকে দেখলে নরমপন্থী রাজনীতির নিষ্ক্রিয়তা জনিত হতাশার প্রতিক্রিয়া

লাল-বাল-পাল

হিসেবেই চরমপন্থা দানা বেঁধেছিল। আদিপর্বে কংগ্রেস যেসব জমিদারদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চলত, তারাও ক্রমে টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার ক্ষেত্রে নরমপন্থীরা আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। তাছাড়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিল না কংগ্রেসের। তার ফলে সাধারণ মানুষের থেকেও আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ তৈরি হয়নি।

পাশাপাশি আদিপর্বের কংগ্রেসের মধ্যের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমপন্থার উদ্ভবে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সংগঠন ও সংবাদপত্রের সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। যেমন বন্দে মাতরম পত্রিকার সম্পাদনাকে কেন্দ্র

করে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল। মহারাষ্ট্রের পুনা সার্বজনিক সভা-র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নরমপন্থী গোখলের সঙ্গে চরমপন্থী তিলকের দ্বন্দ্ব বেধেছিল। এইসব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব জাতীয় কংগ্রেসের উপরও পড়ে।

লর্ড কার্জনের কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্কার নরমপন্থী নিষ্ক্রিয়তাকে বেশি স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আইন করে কলকাতা পৌরসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে দেন কার্জন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আইন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। ঐ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছিল। তাছাড়া বাংলা ভাগ করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। এইসব

পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের স্বশাসনের অযোগ্য 'পৌরুষহীন' জাতি বলে বর্ণনা করত। সেই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে চরমপন্থীরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যক্তিদের 'জাতীয় আদর্শ' বলে তুলে ধরতে থাকে। সেই মতো মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজি উৎসব চালু হয়। তার পাশাপাশি শরীরচর্চার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। বিশেষত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় চরমপন্থী নেতৃত্ব আখড়া,ব্যায়ামাগার প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন। সেইসব জায়গায় কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরা-তরবারি প্রভৃতি চালানো ইত্যাদি শেখানো হতো।

টুকরো কথা

চরমপন্থীদের স্বরাজভাবনা

আদর্শগতভাবে চরমপন্থীদের লক্ষ্য ছিল ‘স্বরাজ’ অর্জন করা। তবে বিভিন্ন চরমপন্থী নেতা বিভিন্নভাবে ‘স্বরাজ’ ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল মনে করতেন স্বরাজ মানে চূড়ান্ত স্বাধীনতা। তাই ব্রিটিশের অধীনে থেকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। অরবিন্দ ঘোষেরও স্বরাজ বিষয়ে ধারণা সেরকমই ছিল। কিন্তু, তিলকের মতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে প্রশাসনকে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে আনার মধ্যে দিয়ে। বাস্তবে

বেশিরভাগ নেতাই স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই স্বশাসনের অধিকারকে বুঝতেন। ফলে চরমপন্থী আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের বদলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সরকারে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য আইনগুলি অমান্য করার মাধ্যমে ব্রিটিশ- শাসনের বিরোধিতা করার ডাক দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ও জিনিসপত্র বর্জনের কথা বলা হয়। সেসবের বিকল্প হিসেবে দেশীয় শিক্ষা, দেশীয় শিল্প প্রভৃতির উপরে জোর দেন চরমপন্থী নেতৃত্ব।

সরলা দেবী

টুকরো কথা

সরলা দেবী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব

‘‘যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙগুলী বলে একটি ছেলে ছিল।.... সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি। .... আমি একটু ভেবে তাকে বললুম --- ‘‘আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব--- এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে

খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর ---আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব।....”

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালী-হয়ে-যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে জোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভুপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। ... শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ।

সেই মেডেলের একদিকে খোদা ছিল— " দেবাঃ দুর্বলর্ঘাতকাঃ" ।"

সরলা দেবীর প্রতাপাদিত্য উৎসবের উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে 'জাতীয় বীর' বলে তুলে ধরার বিপক্ষে ছিলেন।

[উদ্ধৃত অংশটি সরলাদেবী চৌধুরাণী-র জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা

জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন

পুনা শহরে ১৯০৭খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুনায়

চরমপন্থীরা শক্তিশালী সেই যুক্তিতে নরমপন্থীরা অধিবেশনটি সুরাটে করার প্রস্তাব দেন। সুরাট অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়। হই-হট্টগোল ও গোলমালের মধ্যে সুরাট অধিবেশন শেষ হয়। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চরমপন্থী তিলক তখনও চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। কিন্তু ফিরোজ শাহ মেহতা চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এলাহাবাদ অধিবেশন আয়োজন করেন। অন্যদিকে চরমপন্থী নেতারাও নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ফলে কার্যত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী বিবাদে ধাক্কা খেয়েছিল।

নরমপন্থী নেতারা ইংরেজি শিক্ষা থেকে পাওয়া জাতীয়তাবাদের ধারণা দিয়ে ভারতবর্ষকে আধুনিক করার ভাবনা ভেবেছিলেন। অন্যদিকে চরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক শাসনের সার্বিক বিরোধিতা করার ফলে ইংরেজি শিক্ষাজাত জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমালোচনা করতে থাকেন। সেকাজ করতে গিয়ে চরমপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বিচারে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সমস্ত কিছুকেই 'গৌরবময়' বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যদিও সেই 'গৌরবময়' ইতিহাস প্রায় সবক্ষেত্রেই হিন্দুদের গুণকীর্তনে পরিণত হয়েছিল। তবে তা নিয়ে চরমপন্থীদের বিশেষ উদ্‌বেগ ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রেই বিনা বিচারে বেশ কিছু

চরমপন্থী নেতা হিন্দুত্বের ধ্যানধারণাকেই ‘জাতীয় ধারণা’ বলে প্রচার করতেন।

১৯০৬-’০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠী গুলির রাজনৈতিক সংঘাত গুরুতর হয়ে ওঠে। লালা লাজপত রাই ও তিলকের মতো চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। ১৯০৬-’০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল কতদূর পর্যন্ত চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য। তবে এই

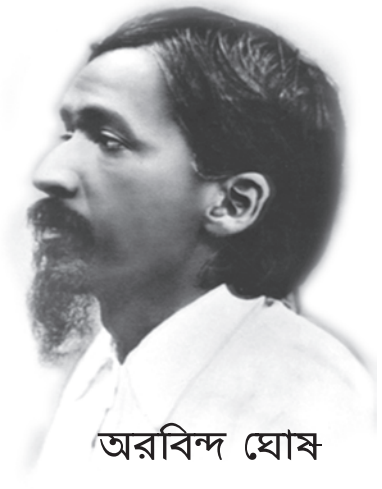
অরবিন্দ ঘোষ

গ্রহণ যোগ্যতার সীমারেখা নিয়ে ক্রমেই মীমাংসার পথ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বেশ কিছু নরমপন্থীর বিরোধিতা সত্ত্বেও চরমপন্থীরা বাংলার নরমপন্থীদের সহায়তায় জিতে যায়। সেই অধিবেশনে স্বরাজ, স্বদেশি, বয়কট (বিদেশি দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বর্জন) ও জাতীয় শিক্ষা--- এই চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনেক নরমপন্থী নেতা ঐ প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেননি। কার্যত কলকাতা অধিবেশনেই কংগ্রেসের ভিতরে চরমপন্থী গোষ্ঠীর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। সেই গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক।

টুকরো কথা

কংগ্রেসের বিভাজন: রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ

"কন্‌গ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কন্‌গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে, কিন্তু ঠিকমত প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

.....

এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহার অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পারো, কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পারো না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতিমহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কন্‌গ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না।....

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন---ইহাতে যাহা হয় তা হোক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে--- এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

.....